চিরকালের প্রেমিকারা

Avgv‡`i g‡bvRM‡Z Zv‡`i wePiY| Zviv wbhZ †KwU `k‡Ki ¯cmLx| Zv‡`i i¡c, †gvnbxq fw½ Awweó K‡i iv‡L Avgv‡`i| G‡`i †KD AvšRwZK ZviKv, †KD ¯vbxq| wKš Zv‡`i AvKIY wPiKvjxb| wPišb GB †cwgKv‡`i wb‡q wj‡L‡Qb

জব্বার হোসেন, হাসান মর্তাজা I সাইমন মোহসিন

অড্রে হেপবার্ন

অড্রে হেপবার্নের নমনীয় কোমল ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব দর্শকদের করে মুগ্ধ। অড্রে ছিলেন ছোটখাটো ছিমছাম দেহ ও সুরভির মতো সরু গলার অধিকারী। তার মায়াকাড়া সৌন্দর্য ও শিশুসুলভ আচরণ তাকে হলিউডের সবচেয়ে সফল অভিনেত্রীদের তালিকাভুক্ত করে। বিখ্যাত ছবি রোমান হলিডেতে অড্রে তার চাঞ্চল্যতাপূর্ণ অভিনয় দ্বারা দর্শকদের মন জয় করেন। এরপর ব্রেকফাস্ট অ্যাট টিফানিস এবং মাই ফেয়ার লেডি ছবিতেও তার সরলতাপূর্ণ অভিনয় ও মায়াকাড়া অভিব্যক্তি দর্শকদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। অড্রে ছিলেন হলিউডের সরলতা ব্যক্তিত্ব ও স্টাইলের এক অনন্য প্রতিমা। কিন্তু ১৯৯২ সালে মলাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অড্রের মৃত্যু ঘটে। তাকে হলিউডের সবচেয়ে দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত করা হয়।

এলিজাবেথ টেলর

এলিজাবেথ টেলরের হলিউডের সবচেয়ে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। তার মোহনীয় রূপ ও শক্তিশালী অভিনয় তাকে হলিউডের সবচেয়ে বিখ্যাত তারকাদের তালিকাভুক্ত করেছে। চলচ্চিত্রে শিশু শিল্পী হিসেবে তার অভিষেক ঘটে। তার নামকরা ছবিগুলোর মধ্যে ক্যারেজ অব ল্যাসি, ন্যাশনাল ভেলভেট, ফাদার অব দ্য ব্রাইড, ক্লিওপেট্রা, জায়ান্ট, লাইফ উইথ ফাদার এবং রেনট্রি কাউন্টি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তার লিটল ওমেন, দ্য বিগ হ্যাংওভার, দ্য টেমিং অব দ্য শ্রিউ এবং সিনথিয়া ছবিগুলো বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্যান্য সুন্দরী অভিনেত্রীদের মতো টেলর কেবল প্রেমিকা চরিত্রে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি বেশ কয়েকটি ছবিতে ভ্যাম্প, পীড়িত নারী ও অহঙ্কারী তরুণীর চরিত্রেও কাজ করেছেন। যেকোনো চরিত্রকেই টেলর তার শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে বেশ নৈপুণ্যতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেন। যা তাকে জনপ্রিয়তার চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অভিনয়ের অসম ক্ষমতা ও মোহনীয় রূপ তাকে হলিউডের সৌন্দর্যের আইকনে পরিণত করে। তার অপরূপ সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি প্রস্ফুটিত হয় ক্লিওপেট্রা ছবিতে। যার জন্য তিনি অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। টেলর তার ৬০ বছরের ক্যারিয়ারে ৫ বার অস্কার পুরস্কার অর্জন করেছেন। তার দীপ্তিশীল সৌন্দর্য ও অভিনয়ের নান্দনিকতা তাকে হলিউডের নারীমূর্তির প্রতিমায় রূপান্তরিত করেছে।

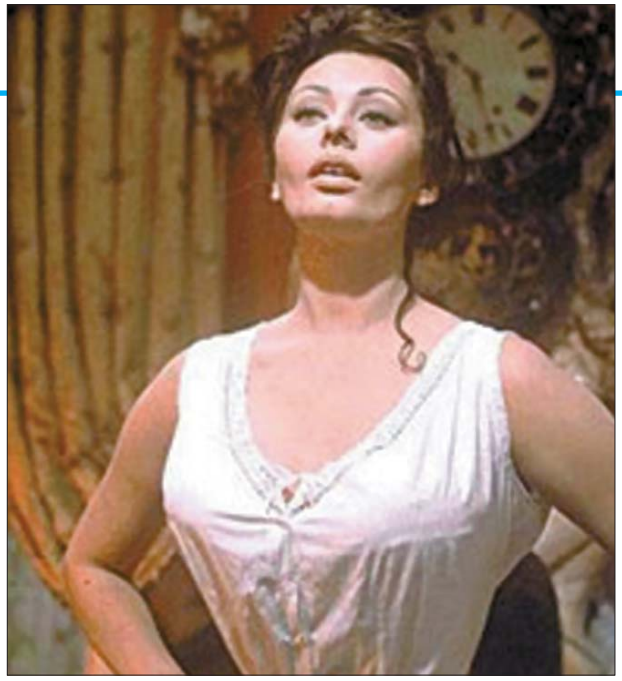

সোফিয়া লরেন

হলিউডে তার প্রথম ছবি ছিল 'দ্য প্রাইড অ্যান্ড দ্য প্যাশান'। যেখানে তিনি কেরি গ্র্যান্ট ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার সঙ্গে কাজ করেন। তার উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে সানফ্লাওয়ার, লাকি টু বি এ ওমেন, এ স্পেশাল ডে, লেডি লিবার্টি এবং এ ব্র্যাক অর্কিড অন্যতম। হলিউডে এসেই এ রূপ সম্রাজ্ঞী তার মোহনীয় সৌন্দর্য দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। তার শক্তিশালী অভিনয় ও অনিন্দিত দৈহিক রূপ হয়ে ওঠে ছেলেদের আকর্ষণের কারণ এবং মেয়েদের করে ঈর্ষান্বিত। সোফিয়াকে ৬০ দশকের সবচেয়ে যৌনাবেদনময়ী নারী বলে আখ্যায়িত করা হত। অনেকের মতে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। ভুবন মোহিনী সোফিয়া তার অনন্য রূপ ও অনন্য অভিনয়ের মাধ্যমে পরিণত হন হলিউডের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকা চরিত্রের এক প্রাণবন্ত প্রতিমূর্তিতে। তার আকর্ষণীয় দেহ ও প্রলোভনীয় অভিব্যক্তি যেকোনো ছেলেকেই চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করতে পারতো।

জুলিয়া রবার্টস

জুলিয়া রবার্টস হলিউডের সবচেয়ে সফল অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। একহারা গড়ন, লম্বা সরু পা, প্রশস্ত কটির অধিকারী জুলিয়াকে ঠিক সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু তার বড় বড় ধূসর চোখ, ঘন কোঁকড়ানো চুল এবং ঝলমলে হাসি, দর্শকের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। চেহারায় যেকোনো অভিব্যক্তি ও আবেগ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক অসম ক্ষমতা জুলিয়ার রয়েছে। তার বিখ্যাত ছবি 'প্রিটি ওমেন' (১৯৯০)-এ তার চরিত্র ছিল একজন পতিতার, যার জন্য তিনি অস্কার অ্যাওয়ার্ডের মনোনীত হন। তিনি উচ্ছলতা ও আবেগের অপূর্ব সংমিশ্রণে চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলেন। তার দ্বিধান্বিত মুখভঙ্গি, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় তাকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছুতে সাহায্য করে। তার বিখ্যাত রোমান্টিক কমেডি মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়েডিং ছবিটি হলিউডে এক নতুন ধারার সূচনা করে। হলিউডে রোমান্টিক কমেডির শূন্যতা অনেকদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু এই ছবিতে জুলিয়ার অভিনয় দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। সেখানেও জুলিয়ার চরিত্র ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, হিংসুটে, বন্ধুসুলভ ও আবেগতাড়িত মেয়ের। চরিত্রটি তিনি নৈপুণ্যতার সঙ্গে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। তার এ ধরনের অভিনয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব জুলিয়াকে যেকোনো ছেলের প্রত্যাশিত প্রেমিকার চরিত্রে রূপান্তরিত করে।

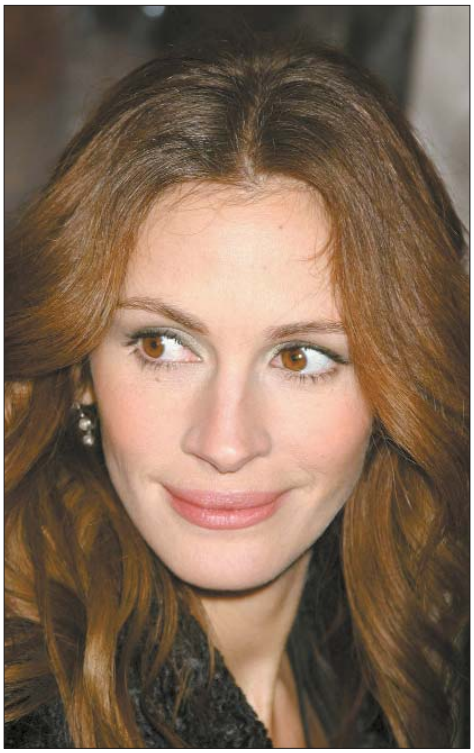

মীনা কুমারী

অপরূপ সৌন্দর্য, তার দরদ ভরা কণ্ঠ, কথা বলার মধুর ভঙ্গি এবং কালজয়ী অভিনয় তাকে হলিউডের ট্রাজেডি কুইনে পরিণত করে। ৫০ ও ৬০-এর দশকের নির্মিত ছবিগুলো ছিল নিপীড়িত নারী বা ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী কেন্দ্রিক। এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে মীনা কুমারী বেশ সাফল্য অর্জন করেন। তার অপূর্ব অভিনয় দিয়ে করেন একচেটিয়া রাজত্ব। 'বেজু বাওরা' এবং 'সাহেব বিবি আওর গোলাম' ছবির মাধ্যমে তিনি ভালোবাসার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তার আসল নাম মেহজাবিন আলী বাক্স। শিশুশিল্পী হিসেবে তার চলচ্চিত্রে পদার্পণ। এরপর তিনি কখনো ব্যর্থ প্রেমিক, কখনো বা অধিকার বঞ্চিত নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এ ধরনের চরিত্রটি তাকে প্রেমিকার আইকনে পরিণত করে। সাহেব, বিবি, আওর গোলাম ছবিতে অধিকার বঞ্চিত স্ত্রীর চরিত্রে তিনি নৈপুণ্যতার সঙ্গে তার অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলেন। বেজু বাওরা ছবিতে তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রেমিকার চরিত্রে তার মোকাবেলা করার মতো কেউ নেই। কিন্তু পর্দা ও বাস্তবের মীনা কুমারীর মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং একাকীত্ব তাকে মদ্যপানে আসক্ত করে তোলে। এ রকম অবনতির মধ্য দিয়েই ১৯৭২ সালে তার জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু ৫০ ও ৬০-এর দশকে মীনা কুমারী নামক ভালোবাসার যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আজও অটুট রয়েছে।

মধুবালা

ভালোবাসার প্রতিমা মধুবালার জন্ম হয় ভালোবাসা দিবসেই। ১৯৩৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লির এক মুসলিম পাঠান পরিবারে তার জন্ম। তার আসল নাম মুমতাজ জাহান বেগম দেহলাবি। ১১ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। পিতা আতাউল্লাহ খান ছিলেন ঘোড়াগাড়ি চালক। উন্নত জীবনযাত্রার আশায় তিনি মুম্বাইয়ে আসেন। ১৯৪২-এ মধুবালা বোম্বে টকিজ কোম্পানির 'বাসান্ত' ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বোম্বে টকিজের কর্মকর্তারা তাকে জোয়ার ভাটা ছবিতেও কাজের সুযোগ দেন। এই ছবিতেই বলিউডে দিলীপ কুমারের অভিষেক ঘটে। ১৪ বছর বয়সে তিনি রাজকাপুর অভিনীত প্রথম ছবি 'নীলকমল' ছবিতেও নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে 'মহল' ছবি থেকেই তার উত্থানের শুরু। যেখানে তিনি দাদামণি অশোক কুমারের সঙ্গে কাজ করেন। দিলীপ কুমারের সঙ্গে তার প্রথম ছবি ছিল তারানা (১৯৫১)। এই ছবির পর দুজনের জুটি পর্দা ও বাস্তব জীবন উভয়তেই বেশ জমে ওঠে। এরপর তিনি দিলীপ কুমারের সঙ্গে সংদিল (১৯৫২) এবং অমর (১৯৫৩) ছবিতে কাজ করেন। এ সময় মনে করা হচ্ছিল যে দিলীপ কুমার মধুবালাকেই বিয়ে করবেন। কিন্তু মধুবালার বাবা এ সম্পর্কের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। যার কারণে সম্পর্কটি এক সময় ভেঙে যায়। এই সময় মধুবালার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে এবং দেখা যায় তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। এই অবস্থাতেই তিনি বলিউডের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের ছবি 'মুঘল-এ আজম' (১৯৬০)-এ কাজ করেন। ছবিতে আনারকলির চরিত্রে অভিনয় তাকে বলিউডে অমর করে দিয়েছে। ছবিটির নির্মাণ কাজ চলাকালীন তিনি দিলীপ কুমারের সঙ্গে সঙ্গতকারণেই কখনো কথা বলেননি। ১৯৬৯ সালে নারী ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি মধুবালা ৩৬ বছর বয়সে মারা যান।

মাধুরী

তার ত্রুটিহীন সৌন্দর্য এবং অপূর্ব অভিনয় তাকে দিয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকা উপাধি। মাধুরী দীক্ষিতকে বলা হয় বলিউডের 'মেরিলিন মনরো'। অনেকে তাকে মধুবালার সঙ্গেও তুলনা করেন। তার ঝলমলে ও উজ্জ্বল হাসি এখন ছেলেদের মনে ছুরির মতো আঘাত হানে। ক্যারিয়ারের শুরুতে তেমন সাফল্য না পেলেও ১৯৮৮ সালে 'তেজাব' ছবির পর তার ভাগ্য ফেরা শুরু করে। এরপর 'দিল' (১৯৯০) এবং 'বেটা' (১৯৯২) এই দুটি ছবি তাকে সফলতার চূড়ায় তুলে দেয়। তারপর আসে বলিউডে সুপারহিট সিনেমা 'হাম আপকে হ্যায় কৌন' (১৯৯৪)। যা মাধুরীকে লেডি অমিতাভের উপাধিতে আখ্যায়িত করে। ৯০-এর দশকের তরুণ-তরুণীদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে ছবি নির্মাণের হিড়িক পড়েছিল। এমন সময় নির্মাতারা এমন কাউকে খুঁজছিলেন, যে একই সঙ্গে ভালো অভিনেত্রী ও আকর্ষণীয়। মাধুরীর মধ্যে এই দুই বৈশিষ্ট্যের কোনো কমতি ছিল না। তার ওপর তিনি ছিলেন ভালো নৃত্যশিল্পী। ফলে মাধুরী পরিচালকদের নয়নমণি হয়ে ওঠেন। এরপর আসে ইয়াশ চোপড়ার 'দ্য দিল তো পাগল হ্যায়' (১৯৯৭) ছবিটি। যেখানে মাধুরীর চরিত্র তাকে ভালোবাসার প্রাণবন্ত প্রতিমাতে রূপান্তরিত করে। এই প্রতিমার খ্যাতি ও সৌন্দর্যকে আরো বিকশিত করে তোলে সঞ্জয় লীলা বানসালীর 'দেবদাস'। এই ছবিতে তার কালজয়ী অভিনয় দর্শকের তাক লাগিয়ে দেয়। ৯০-এর দশকে মাধুরীর মতো সফল আর কেউ ছিলেন না। প্রেমকাহিনী কেন্দ্রিক ছবিতে তিনি এক নতুন ধারার সূচনা করেন। যেকোনো ছেলেই মাধুরীর মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষিত নারী চরিত্রের প্রতিবিম্ব খুঁজে পেত।

ঐশ্বরিয়া রাই

ঐশ্বরিয়া রাইকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তার মতো সুন্দরী মেয়েকে প্রেমিকা হিসেবে চান না, এমন পুরুষ পৃথিবীতে নেই। বলিউডে তার অভিষেক তেমন প্রভাবশালী ছিল না। কিন্তু সঞ্জয় লীলা বানসালীর 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ছবিটি তাকে ভালোবাসার আইকনে পরিণত করে। '৯০-এর দশকের শেষ ভাগে ঐশ্বরিয়া নিজেকে ভালোবাসার জীবন্ত প্রতিমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইয়াশ চোপড়া 'মোহাব্বাতে' ছবিটি তাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। তার ক্যারিয়ারে তিনি প্রেমিকার চরিত্র ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যেমন 'খাকি' ছবিতে তিনি ড্যাম্প এবং 'হামারা দিল আপকে পাস হ্যাঁ' ছবিতে তিনি নিপীড়িত নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু সঞ্জয় লীলা বানসালীর 'দেবদাস' ছবিতে তার অভিনয় তাকে প্রেমের প্রতিমূর্তিতে পরিণত করে। এখন তিনি বলিউডের রানী, ভারতীয় সৌন্দর্যের জীবন প্রতিমা। প্রেম ও ভালোবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

তার সৌন্দর্য, তার অভিনয়ের ক্ষমতাই তাকে শ্রেষ্ঠ প্রেমিকার উপাধি অর্জনে সাহায্য করেছে। যদিও 'দেবদাস', 'হাম দিলদে চুকে সানাম' এবং 'মোহাব্বাতেঁ'- এই তিনটি ছবি ছাড়া অন্য কোনো ছবিতেই তার প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেননি।

সুচিত্রা সেন

মেয়েটির নাম রমা সেনগুপ্তা। বাড়ি পাবনায়। দেশভাগের পর সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমিয়েছিল দেখতে শুনতে মন্দ নয়। কলকাতায় এসে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ জোটে রমার। প্রথম ছবি সুকুমার দাশগুপ্তের 'কাজরী'। ১৯৫৩ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তি পায় ছবিটি। ছবিতে মেয়েটি নায়িকা ছিলেন না, ছিলেন এক্সট্রা। মেয়েটির ভাগ্যে জুটেছিল মোটে ৫টি সংলাপ।

রমাকে চিনতে পারছেন?

সুচিত্রা সেনকে নিশ্চয় পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। এই রমাই পরবর্তীতে সুচিত্রা সেন। ১৯৫৪ সালে 'কাজরী' ছবির সহকারী পরিচালক ক্ষীতিশ রায় বদলে দিয়েছিলেন রমার নাম।

আর বাঙালি দর্শক পেলো তার প্রেমিকা প্রতিমূর্তি।

বিশ্বায়নের আগ পর্যন্ত বাঙালি সমাজে প্রেম ছিল অনেকটা অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রেম ছিল ঠিকই। কিন্তু ছিল না তার প্রকাশ। প্রেম ছিল কল্পনায়। বাঙালির মনন প্রভাবিত ছিল শরৎ-রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রেমের কাঠামো দ্বারা। প্রেমিকার অবয়বটাও তারাই তৈরি করে দিয়েছিলেন।

রুপালি পর্দায় সেই অবয়বের রক্তমাংসের রূপ দিয়েছিলেন সুচিত্রা। টানা চোখের সকাতর চাহনি, বাঁকা হাসি কিংবা আটপৌরে বসন তাকে করে তুলেছিল বাঙালির চিরন্তন প্রেমিকাতে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজে যেকোনো পুরুষের হার্টথ্রব সুচিত্রা। এই একুশ শতকে এসেও। সুচিত্রা আজও শিক্ষিতা, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্বশালী বাঙালি প্রেমিকার আর্কিটাইপ।

ববিতা

পুরো নাম ফরিদা আক্তার। ডাক নাম পপি। আর আমাদের কাছে তিনি ববিতা নামে পরিচিত। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রেমিকার আইডল তিনি। জন্ম ৩০ জুলাই বাগেরহাটে। বাবা এএসএইচ নিজাম উদ্দিন। মা ডা. জাহানারা বেগম। মা পড়তেন কলকাতার লেডি ব্রাবনে। বাবা ইসলামিয়ায়। পরিবারে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আবহ অনেক আগে থেকেই। বড় বোন সুচন্দা ছিলেন চলচ্চিত্রের নায়িকা। স্কুল পালানো দুরন্ত এই মেয়েটি কখনোই ভাবেননি অভিনেত্রী হবেন। কৈশোর উত্তীর্ণ পপি প্রথম অভিনয় করেন জহির রায়হান পরিচালিত 'সংসার' ছবিতে। রাজ্জাকের মেয়ের চরিত্রে। সময়টা '৬৭-৬৮ হবে। তখন তার নাম রাখা হয় 'সুবর্ণা'। ছবিটি ভালো ব্যবসাও করেনি। পরবর্তীতে জহির রায়হান এবং ক্যামেরাম্যান আফজাল চৌধুরী তার নাম বদলে রাখেন 'ববিতা'। নায়িকা হিসেবে তার প্রথম ছবি নূরুল হক বাচ্চু পরিচালিত 'শেষ পর্যন্ত'। এ ছবিটির তত্ত্বাবধানেও ছিলেন জহির রায়হান। এ পর্যন্ত অভিনীত তার ছবির সংখ্যা প্রায়.....। এক সময় তার প্রেমিকা ইমেজকে কেন্দ্র করেই অসংখ্য ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে। ছবিতে তার সঙ্গে সফল জুটি গড়ে উঠেছিল রাজ্জাক, জাফর ইকবাল, ফারুক, সোহেল রানা প্রমুখ অভিনেতার সঙ্গে। তার উল্লেখযোগ্য প্রেমের ছবির মধ্যে আনার কলি, অনন্ত প্রেম, অন্তরালে, প্রতিজ্ঞা, নয়নমণি, ঘরজামাই, লাইলি মজনু, হারজিৎ উল্লেখযোগ্য। তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচিত, প্রসংশিত হন। ৯০-এর দশকে তিনি দেশীয় চলচ্চিত্রের অসুস্থ পরিবেশ, অস্থিরতাজনিত কারণে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসতে থাকেন। কিন্তু তার বিলোল কটাক্ষ, মিষ্টি হাসি আর আরবান গ্ল্যামারের কারণে বাঙালি পুরুষ দর্শকদের মনে তিনি আজও চিরকালের প্রেমিকা হয়ে রয়েছেন।

বিনোদিনী

'ভালোবাসায় ভাগ্য ফেরে না গো, ভালোবাসায় ভাগ্য ফেরে না'। -শ্রীমতি বিনোদনী দাসী। বাঙালি পুরুষকে যিনি ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, ভালোবাসতে শিখিয়েছেন তিনি শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী। জন্ম আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়। মাত্র ১১-১২ বছর বয়সে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দেই তিনি প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায়। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারে তৎকালীন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করে অসামান্য যশ লাভ করেন। মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে তিনি তার খ্যাতি ও ক্ষমতার চরম সিদ্ধির লগ্নে রঙ্গালয়ের সংশ্রব চিরতরে ত্যাগ করেন। বিনোদিনী মাত্র ১২ বছর অভিনয় করেছেন প্রায় ৮০টি নাটকে ৯০টির অধিক ভূমিকায়। বিনোদিনীকে তখনকার সাময়িক পত্রিকাগুলোর ফ্লাওয়ার অব দ্য নেটিভ স্টেজ, প্রাইমা ডোনা অব দ্য বেঙ্গলি স্টেজ, মুন অব দ্য স্টার কোম্পানি ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছিল।

সুবর্ণা মুস্তাফা

ক্যারিয়ারের ৩০ বছর। একজন অভিনয় শিল্পীর জন্য দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময় যদি হয় কৃতিত্বে ভাস্বর, তাহলে তা দর্শক অনুরাগীর ভালোবাসায় সিক্ত হতে বাধ্য। সুবর্ণা মুস্তাফা আমাদের অভিনয় শিল্পের এক বিশ্বস্ত রূপকার। সংস্কৃতি অঙ্গনে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। সৌন্দর্যের দ্যুতি ও মেধার ঐশ্বর্যে অনন্য তিনি। তার এই দুয়ের সম্মেলনে আজও আছেন শীর্ষে। ১৯৭৫ সালে 'বরফ গলা নদী' দিয়ে অভিনয়ের শুরু। এরপর থেকেই দর্শক হৃদয়ে তার সুদৃঢ় অবস্থান। টিভি, মঞ্চ, রেডিও, চলচ্চিত্র- সব মাধ্যমেই তার সফল পদচারণা। স্বপ্ন কন্যা তিনি সেই সময়ে এবং এই সময়েও। শ' শ' নাটকে তার উপস্থিতি। তার হাসি, চাহনি, সংলাপ প্রক্ষেপণের ঢং তাকে দিয়েছে একটা নিজস্ব স্টাইল। মাঝে একটা সময় কিছুটা গ্যাপ দিয়ে আবার যখন অভিনয়ে ফিরে এলেন নতুন ইমেজে তখনো তিনি সমহিমায় উজ্জ্বল। বরফ গলা নদী, হাজার বছর ধরে, কূল নাই কিনারা নাই, জহুরা, তবুও জীবন, আকাশ কুসুম, পারলে না রুমকী, সখা তুমি সখি তুমি, অন্য রকম ভালোবাসা, অয়োময়, কোথাও কেউ নেই এমনি অসংখ্য নাটকের অভিনেত্রী তিনি। অভিনয় করেছেন ঘুড্ডি, নতুন বউ, নয়নের আলো, রাক্ষস, ফুলের মালা, স্ত্রী, পালাবি কোথায়-এর মতো ছবিতেও। শকুন্তলা, যৈবতী কন্যার মন, কীর্তনখোলার মতো মঞ্চ নাটকে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি আজও অনেকের স্মৃতিতে। কিংবদন্তী অভিনেতা, আবৃত্তিকার গোলাম মুস্তাফার সুযোগ্য কন্যা আবৃত্তিতেও অনন্যা। ১৯৮৬ সালের ৩০ আগস্ট বিয়ে করেন অভিনেতা হুমায়ূন ফরীদিকে। মধ্য চল্লিশে এসেও তিনি এখনো লক্ষ তরুণের হৃদয়ে মানস কন্যা।